তারিফ করতেই হয়

আবুল মোমেন

আনোয়ার হোসেন পিন্টু রীতিমতো চমকে দেয়ার মতো কাজ করেছে। ওর সম্পাদিত 'সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ' বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে বহুকালের জন্যে আলাদা মর্যাদায় চিহ্নিত হবে। সম্পাদকের কাজের অনেকগুলো পর্যায়- প্রথমে পরিকল্পনা, তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা ও ছবি সংগ্রহ, সংগৃহীত উপকরণগুলো সম্পাদনা, তারপর প্রেসের কাজ- কম্পোজ, বিন্যাস, ছাপা, বাঁধাই।

প্রথম কাজটাতো ঘরে টেবিলে বসেই সম্ভব, সবটাই একজন ব্যক্তির স্বপ্ন- সাহস- যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। পিন্টু তো সত্যজিৎ-বুঁদ এক সত্যসাধক, চলচ্চিত্রে ব্যুৎপত্তি তার জনশ্রুতির জন্ম দেয়- ফলে প্রথম পর্বটা অর্থাৎ পরিকল্পনা একেবারে এ-ক্লাস। এ প্রসঙ্গে পরে আরেকটু বলবো।

কিন্তু তারপরের পর্বটা বাস্তবায়ন খুবই দুরূহ, তখন পদে পদে মনে হবে কী আকাশকুসুম কল্পনা না ফাঁদতে পারি আমরা। তবে সত্যজিৎ- বিষয়ক নাড়িনক্ষত্র গুলে-খাওয়া পিন্টু লেখা সংগ্রহে হোঁচট খেলেও তা সামলে নিয়েছেন একভাবে। কেউ কথা রাখে না- মানে লেখকরা কেউ; তার শোধ নিয়েছেন তিনি একদিকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ভালো লেখা ছাপিয়ে আর অন্যদিকে ছবির ওপর জোর বাড়িয়ে। তাঁর সত্যজিৎ-সংগ্রহের দৃশ্যগত ভাণ্ডার সত্যিকারের মানিকেই ভরপুর। পাঠকের সৌভাগ্য, অনেকে লেখেননি বলে, অনেক ছবি আর সত্যজিতের অনেক লেখা, সত্যজিৎকে নিয়ে অনেকের লেখা দেখা-পড়ার সুযোগ পেয়ে গেছেন।

যে কথাটা পরে বলতে চেয়েছিলাম সেকথাটা এবার বলি। যথারীতি ফরমায়েশি লেখার মধ্যে কিছু সত্যিই ফরমায়েশিই থেকে গেল। এ দেশে সম্পাদনা নেই, সাধারণ সম্পাদকরা সংগ্রাহক-সংকলক, কারও লেখার সার্জারি বড় একটা চলে না, লেখকদের মানে লাগে বড়। এখানে লেখা জিনিসটার যেন ষোড়শীর মত কুমারীমন, বড় স্পর্শকাতর- সেই অচরিতার্থ সম্পাদনা-সাধের সকল মাধুরী ঢেলেছে পিন্টু সজ্জা ও বিন্যাসে। ছাপায় হরফ নির্বাচনে, সম্ভবত বাধ্য হয়েই, ভ্রান্তিটুকু বাদ দিলে একেবারে গরিবের ঘর আলো করা রাজপুত্তুর। উথলে ওঠা ভালোবাসায় হামলে পড়তে হয়। পিন্টু সার্থক জনক অর্থাৎ সম্পাদক।

আঁতুর থেকে বের করে শিশুটির পূর্ণতা যাচাই করতে করতে প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবি- কেন এই বই, বা কীভাবে সত্যজিতে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথে সত্যজিৎ প্রাসঙ্গিক?

বাবা সুকুমারের গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মৃত্যুশয্যায় তাঁকে একাধিকবার দেখতে গেছেন, এমনকি অনুরোধে গানও শুনিয়েছেন- 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'। তারপর সুকুমারের মৃত্যুর পর অকালবিধবা সুপ্রভা দেবীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন অবোধ শিশুটিকে নিয়ে তার কাছে শান্তিনিকেতনে থাকতে। নানা কারণে, মূলত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে গিয়ে, সুপ্রভার তখন যাওয়া হয়নি শান্তিনিকেতন। পরে, অনেক পরে, কলাভবনে পড়েছিলেন, বিশেষত নন্দলালের ছাত্র হয়েছিলেন সত্যজিৎ। কিন্তু তাতেও সত্যজিৎ ঠিক সংকীর্ণ অর্থে শান্তিনিকেতন ঘরানার মানুষ নন, তাঁকে কেবল রাবীন্দ্রিক মানুষ বলেও চালানো যাবে না। ফেলুদা শান্তিনিকেতনের খাস ফসলের ফলন হতে পারে না, গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার জিনিসটাই ওতে খাটে না। আর চলচ্চিত্রে জীবনকে নেয়া, দেখানো এবং বিশেষ করে নারী-পুরুষের সম্পর্কগুলো ধরা, তারপর জীবনের অসঙ্গতি-বিসঙ্গতি, হালকা-চটুল দিকগুলো দেখা ও বিচার করার মানসটি খাঁটি বাঙালিই নয়, অনেকটাই ইউরোপীয়, যুদ্ধোত্তর ফরাসি অনেকাংশে। তাহলে সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ কেন, কীভাবে?

একথা তো সত্যি, সত্যজিৎ বারবার রবীন্দ্রনাথে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের পরিপার্শ্ব-প্রতিবেশ বাঙালি হলেও মানস-সংস্কৃতিটা বৈশ্বিক, তুলনায় গান ও কবিতা মেজাজ আবহ ভাব ও আবেগে অনেক বেশি বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বমানব- বাঙালি, ভারতীয় এবং বিশ্বপথিক, এবং প্রাচীনকালের সঙ্গে একালের যেন বন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন।

সত্যজিৎ হতে চেয়েছেন একালের বিশ্ববাঙালি। (বাঙালি মনীষীদের মধ্যে ও পথের প্রদর্শক তো রবীন্দ্রনাথই।) তিনি এসেছেন বাংলার আরেক সেরা সৃজনশীল পরিবার থেকে, যাদের আছে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মনোপলি, অদ্ভুত ও লঘু রসের অফুরন্ত ভান্ডার, নতুন কিছুর প্রতি অদম্য কৌতূহল, দৃশ্যশিল্পের কারিগরি ও সৃজনে দুরন্ত সিদ্ধি আর অক্লান্ত সৃজনশীলতা।

সত্যজিৎ একদিকে এই পারিবারিক ধারার বর্তিকাবাহক আর অন্যদিকে নতুন ধারার প্রবর্তক। সেখানে তাঁর পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই গ্রাম্য, ঘরকুনো, পেছন- ফিরে থাকা বাঙালিকে নাগরিক, বৈশ্বিক ও আধুনিকতার পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। সেটা সত্যজিৎ কেবল লুফে নেননি তাতে আরো সামনের দিকে পথ কেটেছেন। চলচ্চিত্রে এই নাগরিক বৈশ্বিক আধুনিক যাত্রায় তাঁকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করতে হয়েছে। সর্বজয়ার রূপদানকারী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের ফসল নন, রবীন্দ্রনাথের। একই কথা অপরূপী মার্কা-মারা সৌমিত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। হ্যাঁ আধুনিক পরিশীলিত বাঙালি তো রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, সত্যজিতের চলচ্চিত্রের কারবার যাদের নিয়ে।

আবেগসর্বস্ব অতিনাটকীয় বাঙালি চলচ্চিত্র জগৎকে সত্যজিৎ এসে দৃশ্যশিল্পের

আধুনিকতম ভাষাটি দিয়ে পরিণত করে তুলেছিলেন। তাঁর হাতে পড়ে দৃশ্য আবেগকে সংযত করে যুক্তি ও ভাবনাকে জায়গা করে দেয়; গল্পটি কাহিনীর সূত্র ধরে পল্লবিত হয় না, ছবির মাধ্যমে ফুটতে থাকে। এ একেবারে নতুন, তাজা এবং মনোমুগ্ধকরভাবে সফল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাজ করেছেন সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে তাই করলেন। আর দু'জনেই বাঙালি মানসকে প্রাদেশিকতা ও ক্ষুদ্রতার গন্ডি ভেঙে বিশ্বলোকের বৃহৎ পটভূমিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন।

সমাপ্তি বা পোস্টমাস্টারের মতো গল্পের পটভূমি গ্রামবাংলা এবং কালিক বৃত্তটি সেকাল, কিন্তু তাতে জীবনের, মানুষের, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, নারী-পুরুষের বা ছেলে-মেয়ের জীবনের চিরায়ত বোধ ও উপলব্ধির সন্ধান পেতে কোনোই অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিৎ পৃথকভাবে স্ব স্ব সৃষ্টিতে- আবার রবীন্দ্রনাথের ওপর নির্ভর করে স্রষ্টা সত্যজিৎ তাঁর নতুন সৃজনে- এক নতুন জীবনদৃষ্টির জন্ম দিয়েছেন, যা বাঙালি এবং সমকালীন। এটা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সম্ভব হতো না, যেমন বিভূতিভূষণের নেহাত পল্লীবাংলার কাহিনী পথের পাঁচালীর

'সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ সম্পাদনার শুরুর দিকে (১৯৯২) সত্যজিৎ রায়ের বাসায় উক্ত গ্রন্থের পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎপুত্র সন্দীপ রায়ের সঙ্গে আলাপরত আনোয়ার হোসেন পিন্টু

সেলুলয়েডে এমন আধুনিক রূপায়ন সম্ভব হতো না যদি না রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টার এবং কুশীলবদের মানস তৈরি করে না দিতেন। সত্যজিৎ রবীন্দ্রঘরানার মানুষ না হয়েও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি এভাবে। আর তাই আনোয়ার হোসেন পিন্টুর এ পরিকল্পনা এবং প্রকাশনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন তার প্রকাশ ঘটে এমন বেশে, এমন রূপে-সৌকর্যে তখন হাত খুলে মন ভরে তারিফ করতেই হয়।

সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ
সম্পাদনা : আনোয়ার হোসেন পিন্টু
পৃষ্ঠা : ৪৪৮
মূল্য : ৫০০ টাকা
প্রকাশনা : সত্যজিৎচর্চা কেন্দ্র
১০৩ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
রোড-৯, ও আর নিজাম রোড
আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।